কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর উপন্যাসে সমাজ কাঠামোর রূপান্তর : সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্র

ড. নাহিদা বেগম*

Abstract : Abdul Gaffar Chowdhury—renowned journalist, political thinker, and a distinguished voice in modern Bangladeshi fiction—offers in his novels a profound literary representation of the socio-economic and political transformation of Bengal. His narratives trace the dissolution of feudal dominance during the colonial era, marked by the exploitation of intermediary classes, the marginalization of women, and the systemic oppression of rural peasants. Choudhury's fiction further examines the postcolonial transition, depicting the disintegration of traditional social relations and the emergence of capitalist structures, industrialization, and the urbanization of Dhaka. Within this framework, he also engages with the rise of the new middle class and the ideological uncertainties that accompanied the birth of an independent Bangladesh. This paper critically analyzes how his selected novels articulate these historical shifts, emphasizing the interplay between individual agency and collective societal transformation through the lens of political, cultural, and institutional dynamics.

পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর (১৯৩৪-২০২২) লেখায় শিল্পিত হয়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিকতার বিলয় ও নবযুগের অভ্যুদয়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের প্রতিচিত্র। তিনি সমাজকে একটি রূপান্তরকামী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখেছেন; যার পরিণতি তাঁর উপন্যাসে নিছক অর্থনৈতিক রূপ বদলেই পরিসমাপ্ত হয়নি, বরং এর অভ্যন্তরের সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত মনস্তাত্ত্বিক নানা প্রভাবসমূহকেও প্রকাশ করেছে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখায় 'মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে জীবন-বীক্ষণের প্রতিশ্রুতি আছে; তবে সে প্রতিশ্রুতি অতি-রোমান্টিকতার মোহাবেগে সহসাই দ্বিধান্বিত।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৮ : ১০৮)। তাঁর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৬০) *নাম না জানা ভোর* (১৯৬২), *নীল যমুনা* (১৯৬৪), *তিমির-সঙ্গিনী* (১৯৬৫), *শেষ রজনীর চাঁদ* (১৯৬৭), *সর্বনাশের আশায়* (১৯৯৮) প্রভৃতি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চিহ্ন রূপায়ণে মার্কসবাদ এবং চরিত্রের মনোজাগতিক গতিবিধি নির্ধারণে রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ জ্ঞাত হয়। তবে তাঁর সমসাময়িক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) ও আবু রুশদের (১৯১৯-২০১০) মতো ঔপন্যাসিকের সাহিত্যানুষঙ্গের প্রধান উপকরণ নর-নারী সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বার্থ, ভোগবাদিতা, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো প্রসঙ্গগুলোর সঙ্গে পূর্ব বাংলার সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ও শ্রেণি শোষণের নানামাত্রিক প্রসঙ্গও আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর উপন্যাসে চর্চিত। এ গবেষণায় অনুসন্ধান করা হবে— আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর উপন্যাসে কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর অভিমুখে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজের

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শ্রেণি বিন্যাস কাঠামো, অর্থনৈতিক বিকাশ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে এই পরিবর্তন উপন্যাসের শিল্প কাঠামোয়— চরিত্র ও আখ্যানের মিথস্ক্রিয়ায় কতটা বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। গবেষণা পদ্ধতিতে পাঠ-প্রতিমূল্যায়নভিত্তিক বিশ্লেষণ (Textual Analysis), সাহিত্যতাত্ত্বিক তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Literary Method), এবং সমাজতাত্ত্বিক পাঠদৃষ্টিভঙ্গি (Sociological Reading) অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের উপন্যাসসমূহ; আর দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Sources) হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা, সাহিত্যসমালোচনা, ইতিহাসভিত্তিক পাঠ ও গবেষণা-নিবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সমকালীন সমাজের অন্তর্লীন শ্রেণি-চক্র, শোষণ ও প্রতিরোধের বাস্তবতা অনুধাবন এ গবেষণার গুরুত্ব নির্ধারণ করবে। অভীষ্ট ফলে দৃষ্ট হবে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর উপন্যাস কেবল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক রূপান্তরের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যিক জীবন ভাষ্য।

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল বলেই আদিম সমাজ অপেক্ষা আধুনিক সমাজ ভিন্ন এবং এ ভিন্নতা সংঘটিত হয়েছে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সাধারণত সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন স্তর ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সামাজিক অবস্থা, সামাজিক পরিকাঠামো ও সমাজের সাংগঠনিক কার্যাবলির পরিবর্তনকে সমাজ কাঠামোর রূপান্তর বলা হয়ে থাকে। পরিবর্তন, বিবর্তন, উন্নয়ন, অগ্রগতি এগুলোর যেকোনোটি ঘটে থাকে এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। 'By social change is mint only such alterna as occur in social organization, that is structure and functions of society.' (উদ্ধৃত, কাদের ও অন্যান্য, ২০২০ : ৬৮০)। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে কখনো আপেক্ষিক অর্থে স্থায়ী আবার কখনো অস্থায়ী, কখনো বস্তুগত ও বাহ্যিক এবং কখনো অবস্তুগত ও অভ্যন্তরীণভাবে পরিবর্তন সংঘটিত হয় সমাজে। যা প্রভাবিত করে ব্যক্তির অর্থ-উৎপাদন প্রক্রিয়া, সকল স্তরের মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও সম্পর্ক যাচাইয়ের দৃষ্টি। অন্যান্য শিল্প মাধ্যম অপেক্ষা উপন্যাসের পটভূমিতেই প্রচ্ছন্ন থাকে সমাজ রূপান্তরের বিধিধ প্রসঙ্গ। কেননা 'উপন্যাসের কাজ একটা বিবর্তনশীল সমাজের বাস্তবতাকে ধরা।' (শহীদ, ২০০৩ : ৬৫)। এছাড়াও 'উপন্যাসের পথ আধুনিক যুগের সমান্তরাল ইতিহাস হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।' (কুণ্ডেরা, ২০১২ : ১৫)। একারণেই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে উপন্যাসের উদ্ভব হলেও শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ের সামাজিক নানা পরিবর্তন বর্তমান উপন্যাসের স্বভাবধর্মকে প্রভাবিত করে এসেছে। আর এ প্রভাবের ধারাবাহিকতায় উপন্যাসে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের স্থান। সামন্তবাদ (Feudalism) একটি প্রাচীন সমাজব্যবস্থা, যেখানে জমির মালিকানা ছিল অভিজাতদের হাতে এবং সাধারণ মানুষ জমি চাষ করে খাজনা দিত এবং এতে সমাজ ছিল শ্রেণিভিত্তিক ও আনুগত্যনির্ভর। উৎপাদনব্যবস্থা ছিল কৃষিনির্ভর এবং অর্থনীতি ছিল আত্মনির্ভরশীল ও বাজারবিচ্ছিন্ন :

> Feudalism is a form of society in which agriculture is the predominant mode of production, and in which the relations of production are based primarily on the direct exploitation of a peasantry by a landed nobility through rents and services. (Bottomore 1993 : 174)

অন্যদিকে পুঁজিতন্ত্র (Capitalism) হলো, মজুরি ভিত্তিক শ্রম ও পণ্য উৎপাদনের এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি উৎপাদকদের জন্য নয়, বরং বাজারে বিক্রয়, বিনিময় ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। এ ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি, উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়মে চলে। মূলত, 'Capitalism is a social system that organizes economic relationships and the division of labor, playing a crucial role in social cohesion

and organization.' (Durkheim, 1997 : 56)। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো উৎপাদন ও শোষণ পদ্ধতিগত: সামন্ততন্ত্রে কৃষক ভূমি-মালিক বা জমিদারের অধীনে খাজনা ও বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে শোষিত হয়; বিপরীতে পুঁজিতন্ত্রে মালিক শ্রেণির অধিক মুনাফার মোহে প্রতিযোগিতার বাজারে অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে শোষিত হয় শ্রমিক। কার্ল মার্কস সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ উভয় সমাজ ব্যবস্থাকেই শোষণমূলক এবং অবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা শ্রেণিসংগ্রামের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। তিনি বলেন, 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.' (Marx & Engles, 2018 : 09)। অর্থাৎ প্রাচীন যুগে দাসপ্রথা, মধ্যযুগে সামন্তবাদ এবং আধুনিক যুগে পুঁজিবাদ প্রতিটি যুগই শ্রেণি-শোষণের যুগ।

ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফাকেন্দ্রিক শাসন নীতি ও ভূমি সংস্কার আইন। ব্রিটিশ সরকার বাংলার দেওয়ানি লাভের পর 'দ্বৈত শাসন' নামে এক ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রচলন করে; যে ব্যবস্থায় শুধু শাসনকার্য পরিচালনা করার ভার নবাবের, অন্যদিকে ব্রিটিশদের হাতে থাকবে রাজস্ব নির্ধারণ ও বণ্টন। অধিক লাভের আশায় এ আইনকে ব্যবহার করে ব্রিটিশরা বিনা শুল্কে কৃষকদের ওপর উচ্চমাত্রায় কর আরোপ করে। ফলে 'ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন এই নীতিমালায় প্রথমেই বিপর্যস্ত হয় গ্রামীণ বাংলার অর্থনীতি।' (স্বপন, ১৯৮৫ : ১০৫)। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি না করে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করায় ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল অবধি বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত রাজস্ব আদায়, লুটপাট, নির্যাতন, ছোট-বড় দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সংঘটিত হয়। এর কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস নতুনভাবে বন্দোবস্ত নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। অবশেষে ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে তাঁর বিখ্যাত ভূমিনীতি ঘোষণা করেন; যার উদ্দেশ্য ছিল :

> (১) সরকারি রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান করা।
>
> (২) যাঁদের হাতে প্রচুর টাকা আসে, শহরের সেই নতুন গজিয়ে ওঠা ধনিক শ্রেণিকে জমিদারি ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থ নিয়োগে উৎসাহিত করা। (অমলেন্দু, ২০১৭ : ১৩)

পূর্বে জমিদারেরা ছিল সরকার এবং কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট মাত্র। জমিতে তাদের কোনো মালিকানা ছিল না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন জমিদার শ্রেণি ভূমিস্বত্ব লাভ করে। কিন্তু

> যদি কোন জমিদার ধার্য তারিখে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে অনিবার্যভাবে তার ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। কোনক্রমেই কারো জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় করা হবে না। (সিরাজুল, ১৯৯৩ : ২৬৭)

এ ব্যবস্থায় বংশ পরম্পরায় জমিদারি আর করায়ত্ত করে রাখা সম্ভব হয় না এবং নিলামকৃত জমিদারি তারাই লাভ করতে শুরু করে যাদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল। পূর্ববঙ্গে এ শ্রেণির জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে রচিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* উপন্যাস। এ উপন্যাসে ইলিয়াস চৌধুরীর পারিবারিক জমিদারিত্ব লাভের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তার পূর্বপুরুষ হায়দর জঙ্গ ছিলেন ফৌজদার। মহীপালের পেশকার আদিত্য শীলের সঙ্গে এক হয়ে লবণের কারবার করে তার নগদ অর্থ মজুত হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে চৌধুরী পরিবারের জমিদারিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার উত্তর-পুরুষ অর্থাৎ ইলিয়াস চৌধুরীর জমিদারি ভাগ্য আর

সুপ্রসন্ন থাকে না। কারণ কোম্পানির সামন্তনীতির (নগদ অর্থে জমিদারি লাভ) সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের পতনের ইতিহাস সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। মূলত যথাযথ শিক্ষার অভাবেই ভূমি-নির্ভর পূর্বাঞ্চলের সামন্ত জমিদারেরা অনেক পিছিয়ে ছিল এবং পূর্ববঙ্গের জমিদাররা তাদের জমিদারি পরিচালনা করতো অধীনস্ত কর্মচারী ও পোষা লাঠিয়াল বাহিনীর লাঠির জোরে। তাদের অন্ধ আনুগত্যে; জয়ে বা পরাজয়ে জমিদারের রাজস্ব অর্জন হতো বা জমিদারি নিলামে উঠতো— এর অন্যথা ছিল না। দৃষ্টান্ত :

> হঠাৎ একদিন বাঘা মাল তার দলবল নিয়ে ইসহাক চৌধুরীর নদী সিকস্তি জমির ওপর হানা দিয়ে বসলো। [...] খবর পেয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে কালু এগিয়ে এলো। ইসহাক মিয়ার কাচারীর সুপ্রশস্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছেড়ে বলেছিল— বহুদিন নুন নেমক খেয়েছি হুজুর, এবার যদি ফিরে আসতে না পারি বাপের গোরের কাছেই কবরটা দেবেন। সেবার কালু বিজয়ীর বেশেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু সেই তার শেষ। তারপর যতদিন বেঁচে ছিল, পঙ্গু শরীর নিয়ে বসে বসে ইউসুফকে লাঠি ভাজা শেখাত। (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ১৪-১৫)

অতিরিক্ত ভোগ ও আভিজাত্য প্রদর্শনের বাহুল্যে অর্থ অপচয়ের যে অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল সামন্তবাদী জমিদারগণ তাও তাদের পতনের অন্যতম একটি কারণ বলা যায়। জমিদারদের বংশীয় আভিজাত্য রক্ষার দায় ছিল স্ত্রী-কন্যাদের আর তাদের অপরিমিত বাসনা চরিতার্থের দায়িত্ব ছিল দাসী-বাঁদিদের। *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* উপন্যাসে দেখা যায় ইলিয়াস চৌধুরীর প্রথম সন্তান ইউনুস চৌধুরী মদ্যপ, নারীসঙ্গ কাতর; দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুব চৌধুরী চরিত্রহীন, কুড়ে ও বখে যাওয়া; শেষ সন্তান ইসহাক চৌধুরী— কিছুটা বৈষয়িক, বংশের ভাঙন রোধে যিনি নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনিও মূর্খ এবং প্রজাপীড়ক। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তাঁর *নীল যমুনা* উপন্যাসের জমিদার হায়দার চৌধুরীর পরিচয়েও উল্লেখ করেছেন :

> বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইজন জমিদার যা করে গেছেন হায়দার চৌধুরীও তার ব্যতিক্রম নন। বাপ জীবিত থাকতেই তার স্বেচ্ছাচার শুরু হয়েছিল। আজ পানসিতে কোন বাইজি নিয়ে মত্ত হন, কাল কোন প্রজার বাড়িতে সুন্দরী কুলবধূ বা কুলকন্যার ওপর হামলা চালান। এ ছাড়া অন্দরে ডজন ডজন সুন্দরী বাঁদীতো ছিলই। (গাফ্‌ফার, ২০০১খ : ১৭১)

ফলত, তাদের জীবনের সঙ্গে বাঁদি পেয়ারী, সুরতি, তারা বাঈ, কুলসুম, মালতিদের নাম জুড়ে থাকতে দেখা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) অনবদ্য সৃষ্টি *জমিদার দর্পণ* (১৮৭৩) নাটকেও সামন্তবাদী জমিদারদের ভোগলিপ্সু স্বভাব প্রতীয়মান হয়। *জমিদার দর্পণ* নাটকে জমিদার হায়ওয়ান আলী সম্পর্কে বিবৃতি :

> জমিদারদের নজরে পড়ে কত কোণের বউ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে। চৌধুরীদের কথা শোনোনি? ওমা তারাতো আস্ত ডাকাত পাড়া পড়সী, জাত-কুটুম, পর্জার-ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর করেচে তারির মাথা খেয়েছে।' (মশাররফ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ : ১৬)

এছাড়াও শ্রমব্যবস্থা পরিচালনা ও জীবনমান উন্নতকরণের আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে সামন্তবাদীদের ছিল অযাচিত উন্নাসিকতা :

> লেখাপড়া? এক চাপা হাসির রেখা অন্ধকারে খেলে গেলো ইসহাক মিয়ার ঠোঁটে। তাঁর বাবা বলতেন— লেখাপড়া শিখবে চাকর বাকর নওকরে, নকরি করতে। বড়লোকের পড়ালেখা অন্য ধাঁচের, দায়িত্ব অনেক। তারা শিখবে কি করে প্রজা শাসন, পালন করতে হবে, দুষ্টকে দমন, শিষ্টকে আশ্রয় দিতে হবে। (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ১০)

একারণে একসময় বংশীয় কৌলীন্য ছাড়া এদেশীয় জমিদারদের অবশিষ্ট কিছু থাকে না। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* উপন্যাসে চৌধুরীদের উত্তর পুরুষের পরিণতি 'গলার পুরু ভাঁজে ভাঁজে যেন একটা সিংহের গর্জন ওৎ পেতে থাকতো।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ৯) সে বংশেরই বর্তমান পরিস্থিতি এমন: 'প্রচণ্ড আভিজাত্যের তাপে এ বংশ আজ হতশ্রী, বাড়ীটাও ভগ্নশ্রী।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ১০)

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* ও *নীল যমুনা* উপন্যাসে সামন্ত প্রথা পতনোম্মুখ হলে জমিদারদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষশক্তি হিসেবে নায়েবদের ভূমিকা অত্যন্ত কর্মতৎপরতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। চৌধুরীদের অস্তিত্ব রক্ষায় তারা গ্রহণ করেছে নানা কূট-কৌশলের আশ্রয়। *নীল যমুনা* উপন্যাস থেকে নায়েব হায়দার চৌধুরীর প্রসঙ্গ :

> এই ইসমাইল সাহেব প্রকৃতই নবীনগর জমিদার পরিবারের হিতৈষী ও বন্ধু। তার বিশ্বস্ততার ফলে হায়দার চৌধুরী চরম ভরাডুবি থেকে বেঁচেছেন। নইলে সূরা ও সাকীর স্রোতেই গোটা জমিদারি নিয়ে এতদিনে তলিয়ে যেতে হত। (গাফ্‌ফার, ২০০১খ : ১৭৩)

চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান উপন্যাসে ইসহাক পুত্র ইউসুফকে নায়েব করিম সকলের অগোচরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। কেননা তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে শহর পরিদর্শন করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সময় ও সমাজ বদলে গেছে; এ সমাজে প্রজা উৎপীড়ক, মদ ও নারীর ভোগাসক্তি নিয়ে ডুবে থেকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে: 'করিম মিয়ার সতর্ক প্রহরাতেই আভিজাত্যের ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশে মানুষ হয়েও ইউসুফ সব কিছুকে নবজাতকের চোখ নিয়ে দেখতে শুরু করেছিল।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ৩২)। এবং উপলব্ধি করেছিল 'বংশ কৌলিন্য দিয়ে নয়, পৌরুষ দিয়ে, কাঞ্চন-মূল্য দিয়ে এবার পৃথিবীতে নতুন আভিজাত্যের মান নির্ণীত হচ্ছে।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ৫৬)। এ কারণে পুঁজিবাদী সমাজের অনুকূলে টিকে থাকার অভিপ্রায়ে সনাতন সামন্তপ্রভুর পরিচয়ের খোলস ভেঙে ইউসুফ চৌধুরী বুর্জোয়া আলী নওয়াজের সহযোগী হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

'ধনের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থানুযায়ী সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়' (রংগলাল, ২০১৪ : ৩০)। *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* উপন্যাসে ধনের উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে এগিয়ে থাকা চরিত্র আলী নওয়াজ। যদিও আলী নওয়াজের পিতা পেশকার শাহনেওয়াজ ছিলেন ইসহাক আলীর পূর্ব পুরুষের নায়েব। কিন্তু ইসহাক আলীর পুত্রদের সুরাসক্তি ও অতিরিক্ত ভোগাকাঙ্ক্ষার সুযোগে আলী নওয়াজদের মতো ধূর্ত পুঁজিপতির উত্থান ঘটে চন্দ্রদ্বীপে :

> ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে, শুধু ভাঙ্গছে। গড়ছে, গড়ছে শুধু গড়ছে। এপারে ভাঙ্গনের আর্তনাদ, ওপারে নতুন সৃষ্টির কলরবে মুখরিত সৃষ্টির ভিত্তি। কিন্তু এবংশের ভাঙ্গনে নতুন যে পলি জমছে, তাতে আলী নওয়াজ খানের প্রতিষ্ঠা। (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ৩৮)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণে আলী নওয়াজদের মতোই পুঁজিপতি লোকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছিল। উপন্যাসে আলী নওয়াজ সম্পর্কে ইসহাক চৌধুরীর মন্তব্য 'বেটা জাত বেনিয়া। টাকার মতো হাতের ময়লা ছাড়া দুনিয়া চেনে না।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ক : ১১)। আলী নওয়াজ তার ব্যবসায়িক পণ্য আনা-নেওয়ার প্রয়োজনে চন্দ্রদ্বীপ থেকে নীলকমলগঞ্জ পর্যন্ত খাল কাটতে চায় এবং এর জন্য সে গরিব অসহায় মানুষদের এমন পরিমাণ ঋণ দেয়; যা তারা কখনও শোধ করতে পারবে না, বিনিময়ে তাদের জমি হয়ে যাবে আলী নওয়াজের পণ্যবাহী রাস্তা। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জমিদার ইসহাক চৌধুরীর পুত্রদেরও আলী নওয়াজের প্রদেয় অপরিমেয় ঋণের কাছে নিঃস্ব হতে হয়। ইউনুস ও ইয়াকুব চৌধুরীর জমি হস্তগত হওয়ার পর বাকি থাকে শুধু ইসহাক চৌধুরীর

অধিকারের সাতবারিয়ার বাগ। এ জমি আত্মসাতের জন্য আলী নওয়াজ আশ্রয় গ্রহণ করে কূট-কৌশলের। সামন্তবাদী সমাজে 'অর্থে প্রতাপ বাড়ে, বংশ কৌলীন্য আসে না।' (গাফ্ফার, ২০০১ক : ৬০)। এবং এ সত্য জেনেই অর্থ ও কৌলীন্যের মোহে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইউসুফ চৌধুরীর কাছে নিজ কন্যা রিজিয়ার বিয়ের প্রস্তাব রাখে আলী নওয়াজ। ইউসুফ চৌধুরীও নত হয় এ রাজনৈতিক প্রস্তাবে। পরিণতিতে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ স্ফীত হওয়ার পথ পায় সনাতন সামন্তবাদী সমাজের প্রশ্রয়ে এবং এরপর : 'চন্দ্রদ্বীপে নতুন খাল কাটা হোক, টিম্বার কোম্পানী হোক, গড়ে উঠুক পাট, ধান, চালের অসংখ্য গোডাউন। তার একচ্ছত্র মালিক ইউসুফ।' (গাফ্ফার, ২০০১ক : ৬২)। মূলত:

> বুর্জোয়ার এ-বিজয় আমাদের ঔপনিবেশিক পরিবেশে, (নিকট অতীতের বাস্তবতার অনুরূপ) নিরঙ্কুশ না হয়ে পারেনি। কেননা, আলী নওয়াজ খাঁ নিজ কন্যা রিজিয়ার সঙ্গে ইসহাক মিয়ার ছেলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইউসুফের বিয়ে দিয়ে আপোষরফা করে নেয়। ঘটনা ইংরেজ আমল থেকে আমাদের দেশে পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যকার সহযোগিতা বাস্তব পরিস্থিতিই স্মরণ করিয়ে দেয়। (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ৭০)

অনুরূপ অর্থ ও কৌলীন্যের বিনিময়-সহযোগী বিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর *নীল যমুনা* উপন্যাসেও দৃশ্যমান। *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* উপন্যাসটি জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের পূর্বাবস্থা নিয়ে আবর্তিত হলেও *নীল যমুনা* উপন্যাসটি জমিদারি প্রথা বিলোপের পর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্টেটের জমিদার ও তাদের অধীনস্থ প্রজাদের কীরূপ জীবনাচার ছিল তার বাস্তবিক অবস্থা নিয়ে রচিত। প্রায় দুইশ বছর ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৭ সালে সংঘটিত হয় দেশবিভাগ। নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার নতুন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টে প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ নামে বিল পেশ করা হয়। এই আইনটি ছিল জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অংশ। ১৯৫১ সালের ১৬ মে এ বিল কার্যকরের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জমি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে খাজনা-আদায়ি অধিগ্রহণ করে সরকার। এ আইন প্রবর্তনের ফলে সরকার ও রায়ত প্রজার মধ্যে জমিতে মধ্যবর্তী স্বার্থের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় এবং সরকারই হয়ে ওঠে একমাত্র জমিদার। চাষিরা জমিতে উপ-সামন্তায়নের তথা আরও মধ্যপক্ষ সৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। অন্যদিকে এ আইনে কোনো নিরবচ্ছিন্ন জোতের সহ-মালিক যাতে ঐ জমির কোনো অংশ কোনো বহিরাগত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সেই জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার পায় সে ব্যবস্থাও ছিল। এ ক্রয় অগ্রাধিকারের বিধান সাধারণ আইনের অংশ হিসেবে এ দেশে কৃষিজমি প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। *নীল যমুনা* উপন্যাসের নবীনগরের জমিদার হায়দার চৌধুরীকে প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারি হারাতে দেখা যায়।

> বিপদের উপর বিপদ। সরকার এই সময় ঠিক করলেন, তারা জমিদারি প্রথা তুলে দেবেন। প্রমাদ গনলেন হায়দার চৌধুরী। নায়েবকে ডেকে বললেন—এখন উপায়। কুশাগ্রবুদ্ধি নায়েব পরামর্শ দিলেন—উপায় আছে হুজুর। আসুন আমাদের কিছু বিশ্বস্ত লোকের নামে জমিগুলো বেনামা করে রাখি। (গাফ্ফার, ২০০১ক : ১৭৩-১৭৪)

নায়েবের পরামর্শে হায়দার চৌধুরী তার নিকট আত্মীয়ের নামে জমিগুলো বেনামা করে রাখে। বেশিরভাগ জমি হায়দার চৌধুরীর সুহৃদ সুন্দর গ্রামের খোদাদাদ খান, নায়েব ও আরও কিছু নিকটজনের নামে কেনা হয়। নায়েব চেয়েছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বেনামা সম্পত্তি উদ্ধার করে সে অর্থ নতুন ব্যবসায় পুঁজি খাটিয়ে জমিদার হায়দার চৌধুরীকে ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তার কোনো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয় না খোদাদাদ খানের ষড়যন্ত্রে। তিনি তার ছেলে কুদরত খানের জন্য হায়দার চৌধুরীর মেয়ে নাসিমাবানুর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। খোদাদাদ খানের বংশ মর্যাদা

নবীনগরের জমিদারদের চাইতে কিছুটা নিম্নস্থ হওয়ায় এ বিয়েতে হায়দার চৌধুরী সায় দেয় না। ফলত, খোদাদাদ খান তার নামে বেনামা করা জমির ওপর হায়দার চৌধুরীর দখলিস্বত্ব তুলে দেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে নিজ পুত্রকে জমিদার বাড়ির আত্মীয় বানানোর উদ্দেশ্য হাসিলে সমর্থ হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসের কুমুদিনী আপন অগ্রজের দুঃসহ ঋণের ভার কমাতে যেমন পারিবারিক বংশ গরিমা, ব্যক্তিত্ববোধের অহংকার বিসর্জন দিয়ে বারোয়ারি পণ্যের কারবারি মধুসূদন নামক মুনাফালোভীর গলায় বরমাল্য দিতে বাধ্য হয়েছিল, নাসিমাও তেমনি বাধ্য হয় পিতার বেনামা জমি পুনরুদ্ধারে চৌধুরী বংশের আভিজাত্যকে পদদলিত করে কুদরত খানের ঘরের বউ হতে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে :

> আসলে খোদাদাদ খানের জমি জমার উপর কোনো লোভ ছিল না। লোভ ছিল বংশ গৌরবের ওপর। তাই সে এই সুযোগে হায়দার চৌধুরীর মেয়েকে ঘরে ছেলের বৌ করে এনে বংশ গৌরবের ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছিলেন। (গাফ্‌ফার, ২০০১খ : ১৭৪-৭৫)

পুঁজিতন্ত্রে ব্যক্তি সম্পর্কের স্বরূপ প্রসঙ্গে রঙ্গনকান্তি জানা বলেন, ‘পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক বৈধ যৌন সম্পর্কও হয়ে পড়েছে বিত্তনির্ভর।’ (২০১৭ : ২৫২)। এক্ষেত্রে যৌন বৈধতা যদি বিয়ে ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে তাহলে পুঁজিবাদী সমাজে নর-নারীর আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তির দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সামন্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত প্রথম দুটি উপন্যাস *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* ও *নীল যমুনায়* পুঁজির অপ্রতিরোধ্য গতিবেগের পথরেখা সুনিশ্চিত করেছিল জমিদার পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে উঠতি ধনীর কন্যা বা কোনো ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

জমিদারি ব্যবস্থা পুরোপুরি বিলোপের পর পূর্ববাংলায় অতিদ্রুত পুঁজি-নির্ভর সমাজকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও কোম্পানির শাসনামলে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যনীতির ফলে একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে ওঠেনি; তেমনি তৈরি হয়নি শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণি। ঐতিহাসিক সে পটভূমি সম্পর্কে W.W.Hunter (1840-1900) বলেছেন, ‘For the whole tendency of the [Permanent] Settlement was to acknowledge as the landholders the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen.’ (1876 : 162)। আবার পাকিস্তান পর্বেও ঢাকায় নতুন নতুন কার্যালয়, বাণিজ্য ও শিল্প ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শুরু হলে এসব পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মানুষ। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় পেশাগত জীবনে স্ব-অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও ঔপনিবেশিক শাসনের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারী আচরণ ও অসম অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক নীতির কারণে শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট অবাঙালি মুসলমানদের আধিপত্যই বজায় থাকে সর্বত্র। কিছুক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের মানুষ বিভিন্ন বেসরকারি পেশায় তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হলেও প্রতিরক্ষা ও সামরিক বাহিনীর চাকরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প-কারখানার টেকনিশিয়ান, ম্যানেজার প্রভৃতি সরকারি চাকরিতে পশ্চিমাঞ্চলের লোক ও অবাঙালিদের ঠেকিয়ে তাদের টিকে থাকা সহজ হয়ে ওঠে না। বরং কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের নয়া উপনিবেশিক শাসন কায়েমে এমন ব্যবস্থা করে যাতে করে পূর্ববঙ্গীয় সমাজেও পুঁজি-নির্ভর সমাজের দ্রুত বিস্তার ঘটে।

> ৫০ ও ৬০ দশকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রদান করে পুঁজিপতি তৈরির চেষ্টা এবং বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের পারমিট লাইসেন্স বিতরণ প্রক্রিয়ায় এখানে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়। ৬০ দশকে এ অঞ্চলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে নির্মাণ কাজের প্রসার কিছু ঠিকাদারকে আকস্মিকভাবে দ্রুত সম্পত্তিশালী করে তোলে। (আনু, ২০২২: ৪৮)

এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ কর্মসূচির কারণে এ অঞ্চলের নব্য প্রভাবশালী অংশ নগদ টাকার সঙ্গে পরিচিত হয়।

> পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় যে বাঙালিরা শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তাদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক কিছু জমিজমার মালিক হলেও তাদের অধিকাংশেরই কোনো উল্লেখযোগ্য ভূ-সম্পত্তি ছিল না। তাছাড়া যাঁদের কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি ছিল তারাও কৃষি উদ্বৃত্তের কোনো অংশ শিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন এমন কোনো উদাহরণ দেখা যায়নি। (বদরুদ্দীন, ১৯৯৩ : ৬৫)

ফলে ব্যক্তির সামাজিক স্তরের আধিপত্য সৃষ্টির যে বংশ পরম্পরার ইতিহাস তা ঢাকার নাগরিক সমাজে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। এর পরিবর্তে চোরাচালান, খাদ্য মজুত, নারী পাচারসহ অবৈধ প্রক্রিয়ায় হঠাৎ যারা ধনী হয়ে ওঠে, তারাই সমাজ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কেননা 'এরা ছিল একই সঙ্গে ব্যাংকপুঁজি, শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্যপুঁজির প্রধান নিয়ন্ত্রক।' (আকাশ, ১৯৯৩ : ১৩২)। ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের অবনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে নব্য ধনী, পুঁজিবাজারে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় সংগ্রামরত মধ্যবিত্ত ও পুঁজির চরম প্রতাপে সর্বস্ব হারিয়ে নিম্নবিত্তে উপনীত হওয়া বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নিয়ে রচিত উপন্যাস আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর *নাম না জানা ভোর*, *তিমির সঙ্গিনী* ও *শেষ রজনীর চাঁদ*।

পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক নগরায়ণ প্রক্রিয়ার। ইউরোপে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে নতুন ঢাকার যে নির্মীয়মান চিত্র *তিমির সঙ্গিনী* উপন্যাসে দেখা যায় :

> লোকে বলে কলোনী, কলোনী নয়, আসলে উপশহর। উপকথার দৈত্যের মত কে যেন নিষ্ঠুর হাতে নিমিষে গড়ে তুলছে অসংখ্য ফ্ল্যাট প্রাসাদোপম বাড়ী, অফিস, বাজার, স্কুল, মসজিদ, সেই সঙ্গে প্রশস্ত পীচ ঢালা পথ। আগে যেখানে ছিল ধোপার বস্তী, এখন সেখানে কোন ব্যাঙ্কের সাহেব সুবা কর্মচারীদের কোয়াটার, আগে যেখানে ছিল ছোট টিনের খাপড়া, কিম্বা খড়ের দোচালা, এখন সেখানে আকাশে মাথা তোলা বাড়ী। (গাফ্ফার, ২০০১ঘ : ৪৮৯)

সে সময় বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িয়ে পড়েছিল। *নাম না জানা ভোর* উপন্যাসের চরিত্র ইফতেখারের জীবন বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে ছিল একজন স্কুল শিক্ষক। সমাজ রূপান্তরের ঘোলাটে আবহাওয়ায় সে পেশা বদল করে হোসিয়ারি গুডসের ব্যবসায় নামে। মূলত এটা ছিল মদের চোরাকারবারি ব্যবসা। অবৈধ পথে আয় করে দুই বছরের মধ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠে ইফতেখার। তার বর্তমান সামাজিক অবস্থান:

> সঙ্গীত সমিতি, উদ্বাস্তু সঙ্ঘ, পিপল্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে ইসলাম, এমনকি নিজের জেলার সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। সঙ্গীত সমিতির বড় বড় অনুষ্ঠান তো ওকে ছাড়া হয়ই না। এক ডোনেশান দিতেই চারশো পাঁচশো টাকা প্রতি মাসে বেরিয়ে যায়। (গাফ্ফার, ২০০১গ : ৪০২)

নগরে আগত মানুষের মধ্য থেকে অবৈধ পথে পুঁজিপতি হয়ে ওঠা আরো একটি চরিত্র *তিমির সঙ্গিনী* উপন্যাসের সুলেমান চৌধুরী। তার ধনপতি হওয়ার ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন :

> পড়াশোনা আর সংসার চালানোর জন্য এসময় আমি না করেছি এমন কোন কাজ নেই। কোন কাজে লজ্জা আবার কোন কাজে বিবেক প্রথম দিকটায় বড় বেঁকে দাঁড়াত। [...] এসময় জাহানারার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ। জাহানারার বাবা, আমার শ্বশুরের কথা।

> বংশ পরম্পরাক্রমে তিন-পুরুষ ধরে তারা গোস্ত-বিক্রেতা ছিলেন। চতুর্থ পুরুষে রূপান্তর ঘটল। (গাফ্‌ফার, ২০০১ঘ : ৫০৭)

তিনি বৈবাহিকসূত্রে কিছু সম্পত্তির মালিক হলেও তার ধনী হওয়ার প্রক্রিয়া ছিল মূলত নিজের চতুর বুদ্ধি। বিদেশি পণ্যের আদলে নকল পণ্য তৈরি করে সস্তায় বিক্রি করেন তিনি। বিভিন্ন পণ্যের গায়ে নাম এমনভাবে লিখেন যে বোঝার উপায় থাকে না সেটি আসলে দেশি না বিদেশি।

'পুঁজিবাদের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ও সামাজিক চরিত্র এবং এর বিপরীতে ভোগের, ক্ষমতার ও বিলাসিতার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবন।' (আকাশ, ২০১৯ : ২০)। হঠাৎ অর্থাগমনের ফলে পুঁজিপতিদের যাপিত জীবনে, আচরণে ও সম্পর্ক পরিচর্যায় যে ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা *নাম না জানা ভোর* উপন্যাসের ইফতেখার ও *তিমির সঙ্গিনী* উপন্যাসের সুলেমান উভয়ের জীবনেই প্রত্যক্ষ। *নাম না জানা ভোর* উপন্যাসে আঙুল ফুলে কলা গাছ বনে যাওয়া ইফতেখার জীবনের মান উন্নয়নে দুই তলা বাড়ি কিনে সেটাকে তিনতলা বানায়। যেখানে অর্থনৈতিক মন্দায় সাধারণ মানুষের প্রাণান্তকর অবস্থা বিরাজমান সেখানে ইফতেখার তার পোষা কুকুরকে দেখাশোনা করার জন্য দুজন চাকর রাখে। রোজ চার কেজি করে মাংস খাওয়ায়। গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনা স্ত্রীকে শহুরে ছাঁচে তৈরি করে, চালচলনে চৌকস করতে ইংরেজিতে কথা শেখায়, মাস্টার রেখে গান শেখায়। স্ত্রীকে অপরূপা রাখার জন্য আধুনিক মেকআপ, পাউডারে ঘষামাজায় অভ্যস্ত করে। আপন সন্তানদের 'করিম' আর 'রাজিয়া' নামকে কায়দা করে 'ক্যারি' ও 'রোজি' ডাকে। কিন্তু তার জীবনে যতই অর্থের প্রতাপ উপর্যুপরি বাড়তে থাকে, ততই কমতে শুরু করে স্ত্রী ও সন্তানদের মূল্য। 'New economic basis for a higher form of the family and of the relations between the sexes will be created.' (Marx, 2016 : 514-516)। কার্ল মার্কসের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্ক নগদ অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে এবং এ কারণেই পার্লার, নাইট ক্লাবে যাওয়া হাল ফ্যাশনের স্ত্রীও ইফতেখারের ভেতরে কোনো আকর্ষণ তৈরি করতে পারে না এবং পুঁজির অপ্রতিরোধ্য আগ্রাসী আক্রমণেই ঐতিহ্যবাহী পরিবার প্রথা, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে এরূপ প্রদর্শনপ্রিয় কাঠামোয় আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিমির সঙ্গিনী উপন্যাসেও সুলেমান চৌধুরী তার স্ত্রী ও কন্যাদের কারো সঙ্গই উপভোগ করেন না। বৈবাহিক জীবনের অতিক্রান্ত বিশ বছর পরও তিনি নিজের মনকে প্রশ্ন করেন 'জাহানারাকে নিয়ে কি সুখী হইনি আমি?' (গাফ্‌ফার, ২০০১ঘ : ৪৫৫)। সে প্রশ্নের উত্তর নিজের আত্মার কাছেই পরিষ্কার করেন তিনি: 'বিয়ের পর পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি বছর জাহানারা সন্তান জন্ম দিয়েছে। আমারই সন্তান তারা। কিন্তু কেউ ভালবাসার সন্তান নয়। জৈব প্রয়োজনের সন্তান। (গাফ্‌ফার, ২০০১ঘ : ৪৫৬)। আবার তার দুই মেয়ে আখতারী ও মুশতারী দুজনও পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। বড় মেয়ে কলেজ জীবনে ভালোবেসে বিয়ে করেছে ব্যবসায়ী হায়দারকে। কিন্তু সে ভালোবাসা স্থায়ী হয়নি তাদের। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও স্বাধীনতা থাকলেও দুজনের পছন্দ এক না হওয়ায় তাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সূত্রে আপন আত্মজার প্রতিও সে কোনো টান অনুভব করে না। তার অপেক্ষা কেবল নতুন কোনো পুরুষ সান্নিধ্যের। দ্বিতীয় মেয়ে মুশতারীও তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর পিতা ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির জন্য তাকে চারিত্রিক লাম্পট্য থাকা সত্ত্বেও তারই ব্যবসায়িক কনসালট্যান্টকে বিয়ে করতে প্ররোচিত করে, কিন্তু অন্যায় জেনেও পিতাকে প্রতিহত করার মতো মানসিক শক্তি সে অনুভব করে না। মূলত পুঁজিতন্ত্রের সামাজিক অন্বয়হীনতাই তাদেরকে এরূপ বন্ধনহীন সম্পর্কের দিকে তাড়িত করেছে।

> পণ্য-উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে মানবিক সত্তার চরম অবমাননা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যান্ত্রিকায়ন, শ্রম-বিভাজন, কঠোর বিশেষজ্ঞায়ন, ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা, জাগতিক পরাভব— এসব প্রবণতা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে মানুষ অনিবার্যভাবে নিপতিত হলো একাকিত্বের গভীর গুহায়। (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৭ : ৩২)

এদেশে পুঁজিতন্ত্র ব্যক্তিমানুষকে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেও তাকে একই সঙ্গে ছুঁড়ে দিয়েছে যে জগতের দিকে সেখানে রয়েছে অপরিমিত ভোগ, ব্যক্তি-মালিকানার দাপট ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীন সম্পর্কের সহাবস্থান। ফলে পুঁজির ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ ও পুঁজিহীন মানুষকে প্রতিনিয়ত দাঁড়াতে হয় একে অন্যের শ্রেণিশত্রু হিসেবে। *নাম না জানা ভোর* উপন্যাসে ইফতেখারের অর্থনৈতিক উত্থানের সঙ্গে স্ত্রী নাসিমার মনোজগতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা ধনতান্ত্রিক সমাজের বিষক্রিয়ার অস্বাভাবিক ফল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একসময়ে গ্রামে বেড়ে ওঠা সহজ সরল মেয়েটি শহুরে প্রভাবে অবজ্ঞা করতে শুরু করে গ্রাম থেকে আগত অপরাপর সকল আত্মীয়-পরিজনকে।

> শহরে যারা থাকেনা, তাদের অনেকেই শহরের জিনিষপত্র ব্যবহার করতে জানেনা। এইতো আমার আপন ভাই এসেছিল, বেসিনে হাত মুখ ধুতে জানেনা, লেভেটরী-ক্লীন রাখতে জানেনা। সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। স্প্রীংয়ের সোফায় বসত সে দোল খেতে। এমন ন্যাষ্টি হ্যাবিট। (গাফ্ফার, ২০০১গ : ৪০১)

অন্যদিকে শহরে নতুন গজিয়ে ওঠা এই শ্রেণিটি সম্পর্কে গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষের মনোভাবেও মমত্ব, শ্রদ্ধা, সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। *তিমির সঙ্গিনী* উপন্যাসে সাজ্জাদ সুলেমান চৌধুরীর বাড়ির জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রিত অতিথিদের অহমিকাময় মুখ দেখে ভাবে :

> কতগুলো জন্তু যেন এক সঙ্গে এখানে বসে মানুষের অভিনয় করছে। পোষাক আর ভঙ্গীটা সরিয়ে নিলে বেরিয়ে পড়বে একদল ইতর, ইতরের চাইতেও অধম একদল জন্তু। পদ, পোষাক আর সম্ভোগ দিয়েই এদের মনুষ্যত্বের মাপকাঠি তৈরী। মানবজীবনের কোন মহৎ বৃত্তি, সুকুমার বৃত্তি, উচ্চ ভাব, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্তি, আগ্রহ নেই। অথচ তারই সমঝদার বনবার কি নিখুঁত কৌশল আর ভঙ্গীটা এরা রপ্ত করে নিয়েছে। (গাফ্ফার, ২০০১ঘ : ৪৮০)

মূলত ব্যক্তি নিজের স্তরকে অতিক্রম করতে না পারার হীনম্মন্যতা থেকে পরিহাস বা রসিকতা নামান্তরে তাচ্ছিল্য করে থাকে। একারণে সমাজ যতই পুঁজির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই উচ্চ, মধ্য, নিম্ন সকল শ্রেণির মধ্যে এই অযৌক্তিক পরিহাস করার প্রবণতা বাড়ছে; বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের এও আরেক ধরনের মনোবিকৃতি।

সমাজ রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে পুঁজিতন্ত্র ব্যক্তির ধনী হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতার শ্রমবাজার তৈরি করে মুদ্রাকে করে তুলেছে সমাজের সর্বময় ক্ষমতার উৎস। এ যাত্রায় ধনীদের সহযোগী হয়েছে মধ্যবিত্ত। 'তাদের মধ্য থেকে যেমন বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব হতে পারে, তেমনি প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণির অবনমিত রূপও সৃষ্টি হতে পারে।' (ইদ্‌রিস, ১৯৮৫ : ৩)। তাদের অবস্থান সব সময় এমন ঝুঁকিপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল বলেই তারা যে কোনো উপায়ে নিজেদের নিম্নমুখী পতন ঠেকিয়ে স্ব-অবস্থান ধরে রাখতে চায় এবং নিজেদের সুরক্ষিতকরণের প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত উচ্চবিত্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হয়। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণিগতভাবে বুর্জোয়া শ্রেণিরই অংশ।' (আনু, ২০২২ : ১৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে হয়েছিল সব ধরনের সামন্ত বিধি, সংস্কার ও সনাতন

মূল্যবোধের সঙ্গে। কিন্তু বাংলাদেশে যখন চক্রানুক্রমিকভাবে পুঁজির বর্ধিত পুনরুৎপাদন শুরু হয়েছে, তখনই সমাজে পুঁজিপতি মধ্যবিত্ত বা মার্কসীয় অর্থে বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটেছে। ফলে:

> বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী নয়। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল সহযোগী শ্রেণী মাত্র। কেউ এদের মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া বলেছেন, কেউ বলেছেন নয়া ঔপনিবেশিক, কেউ বলেছেন আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এজেন্ট। (আজিজুল, ২০১১ : ৪৬)

তিমির সঙ্গিনী উপন্যাসে এই এজেন্ট সুলেমানের ম্যানেজার মুনাওয়ার। সুলেমানের স্বার্থে সে অফিসের কর্মচারীদের ঠকায়। শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাতা ও ইনক্রিমেন্ট থেকে বঞ্চিত করে, অল্প টাকা খরচ করেই মুখ বন্ধ রাখে শ্রমিক নেতাদের এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন করে রাখে; যাতে করে তারা একতাবদ্ধ হয়ে কখনও আন্দোলন করতে না পারে। সুলেমান চৌধুরী কখনো শ্রমিকদের একতার বিষয়ে প্রশ্ন তুললে মুনাওয়ার বলে :

> যতদিন আমি আছি, ততদিন তো নয়। একটা সেকসনের বিরুদ্ধে আরেকটা সেকসনকে খেপিয়ে রেখেছি। তাছাড়া ডেসপ্যাচ সেকসনের কামাল সাহেব আছেন। বলতে গেলে এমপ্লয়িদের তিনিই আন-অফিসিয়াল নেতা। মিসিলিনিয়াস হেড্ থেকে তাকে আমরা মাসে দুশো টাকা গোপনে অতিরিক্ত দি। এমপ্লয়িরাও জানে, কামাল সাহেবের মত তাদের আর দ্বিতীয় দরদী লোক অফিসে কেউ নেই। যেমন দরদী, তেমনি নিঃস্বার্থ। (গাফ্‌ফার, ২০০১ঘ : ৫৩৬)

মুনওয়ারের এ আচরণ পুঁজিবাদী সমাজের চরম বিকশিত বুর্জোয়াদের আচরণসদৃশ। তাদের মতো পেটি বুর্জোয়াদের বর্তমান প্রকৃতি প্রসঙ্গে বিনায়ক সেনের মন্তব্য :

> নগরায়ণ, আধুনিকায়ন, শিল্পায়নের মাধ্যমে গঠিত নতুন মধ্যবিত্ত কৃষির সঙ্গে জড়িত মধ্যবিত্তের মতো আচরণ করবে না। তারা আগের মতো যৌথ জীবন যাপন করে না। সাধারণত উন্নয়নশীল থেকে মধ্য আয়ের স্তরে যাওয়ার পথে সামষ্টিক আন্দোলন হয়। কিন্তু মধ্য আয়ে চলে গেলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গতিশীলতার সন্ধান পেয়ে যায়। তখন তাদের মনোযোগ থাকে জীবিকাকেন্দ্রিক। জীবনমান বাড়ানোর কোনো সুযোগ তারা হারাতে চায় না। শুধু আমাদের দেশে নয়, উন্নত দেশেও এত বেশি গতিশীলতা এসেছে যে ধনসম্পদ অর্জনের ইঁদুর দৌড় দেখা যাচ্ছে। এখন দেখছি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অসহযোগিতার সম্পর্ক। এ সময়ে তাদের কাছ থেকে উন্নত সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিগঠন আশা করা বৃথা। (২০১৪ : ১০)

আবার এ সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে পরিবর্তিত সামাজিক অবকাঠামোয় বাংলাদেশে উদ্ভূত নতুন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন ও জীবিকা নির্মাণের পথ সকলের জন্য মসৃণ ছিল এমন নয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে ঢাকায় যে বিপুল জনসংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাদের এক অংশ প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, আমলাদের দুর্নীতি, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ ব্যবসায় নেমে কোটিপতি হয়ে উঠলেও অপর অংশ পুঁজিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে চরম দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর *শেষ রজনীর চাঁদ* উপন্যাসেও এরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরিফ-সালেহা, রিয়াজ-রোশনাদের মতো বহু পরিবার বর্ধিত ঢাকায় শিল্প-কারখানা ও কর্পোরেট অফিসে স্বল্পবেতনে নিম্ন মধ্যবিত্তের সংগ্রামী জীবন কাটায়। এ উপন্যাসে আরিফ পেশায় একজন কেরানি। ভারবাহী জীবন তার। ছমাস খরচ কমিয়ে তিনশো টাকা ধার করে বিয়ে করেছে। নব পরিণীতা স্ত্রী ঘর গোছাতে গেলে চেয়ার প্রসঙ্গে সে বলে: 'বিয়ের দিন লোকজন আসবে, তাই এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনেছিলাম, ফেরত দিতে হবে।' (গাফ্‌ফার, ২০০১ঙ : ২৭০)। আরিফের দরিদ্র জীবনে অপর এক

দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা স্ত্রীর ভাইয়ের পড়া, মায়ের চিকিৎসার মতো দায়িত্ব বর্তে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তার আতঙ্কিত মনোভাব হয় এমন :

> মাসের শেষাশেষি হঠাৎ তাকে আসতে হয়েছে। তার হাতে তেমন টাকা নেই। আর শহর বন্দরের ডাক্তার ডাকতে গেলে যে হরেক রকম সমস্যা দেখা দেবে, সে কথাটাও সে আগে ভেবে দেখেনি। তাই হঠাৎ তাকে চুপ করতে হল। (গাফ্‌ফার, ২০০১ঙ : ৩২৬)

উপন্যাসে রিয়াজের জীবনও নষ্ট হয় নাগরিক জীবনের স্বল্পবেতনের দুষ্টচক্রে পড়ে। রিয়াজ লেখা পড়া শিখে উচ্চপদস্থ অফিসার হতে গিয়েও পারেনি। জীবনের প্রয়োজনে তাকে বেছে নিতে হয় সাংবাদিকতা পেশা। সমস্ত রাত জেগেও সে সংসারের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না এবং শ্রম ও পারিশ্রমিকের বৈষম্য তাকে প্রতিনিয়ত হতাশ করে। নিজের আত্মিক এ পরাজয়ে ভালোবেসে বিয়ে করে আনা স্ত্রীর সঙ্গেও ঘটে মানসিক দূরত্ব। শেষাবধি জুয়ায় আসক্ত হয়ে জীবনকে ছেড়ে দেয় এক চরম অনিশ্চিত পরিণতির দিকে।

মূলত পুঁজিবাদ এমন এক ব্যবস্থা; 'ওই ব্যবস্থায় হৃদয় বলে কিছু নেই। নৈতিকতাও অনুপস্থিত। আর সে কিছুই বোঝে না, বোঝে কেবল মুনাফা। আর মুনাফা মানেই হচ্ছে শোষণ।' (সিরাজুল, ২০১৭: ১৭)। এ শোষণে ধনীদের অপরিসীম ধনলিপ্সায় দরিদ্রকে কেবল নিজেকে উজাড় করে দিয়েই যেতে হয়। প্রাপ্তির প্রত্যাশা জন্মালেই তাকে হারাতে হয় নিজ অভ্যস্ত কর্ম ও পরিচিত জীবনের স্বাভাবিকতা। *শেষ রজনীর চাঁদ* উপন্যাসে শ্রমবাজারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া চরিত্র হাফিজের বাবা। হাফিজের ভাষ্যে তার বাবার প্রসঙ্গ :

> আজ ত্রিশ বৎসর বাবা এই প্রেসে কাজ করছেন। বিশ বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে ফাইন আর্ট প্রেসে ঢুকেছিলেন আর আজ তার বয়স পঞ্চাশ বছর। এই ত্রিশ বছর ভূতের বেগার খেটে প্রেসটাকে দাঁড় করিয়েছেন, আর তারই প্রতিদান হল, তুমি বুড়ো হয়েছ, এবার বিদায় নাও। তার অপরাধ? [...] যারা অতিরিক্ত খাটুনির মজুরি পাবে, তাদের তা দিয়ে দেওয়ার জন্য মালিককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মালিক ধারণা করছেন বাবাই এই গণ্ডগোলের নেতা। তাই তাকে সরাবার এই চেষ্টা। (গাফ্‌ফার, ২০০১ঙ : ৩০৯)

মূলত সমাজ রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় দরিদ্র শ্রেণি সর্বদাই তাদের শ্রম ও ঘাম দিয়ে পুঁজিতন্ত্র পরিপুষ্ট হওয়ার পথ তৈরি করেছে কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হলেও সমাজে তাদের শোষণের ধারাবাহিক রূপ রয়ে গেছে অভিন্ন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমাজকাঠামোয় ধনতন্ত্র বিকাশের এক বিশেষ পর্যায় সৃষ্টি হয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে পুঁজির দিকে ধাবিত হয়েছিল কয়েক দশকে এর রূপ বদলে এতই স্ফীতকায় হয় যে তার আগ্রাসন ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তার 'রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার ছিল বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, ভাবাদর্শগত ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল সমাজতন্ত্র।' (রংগলাল, ২০১৪ : ৮৩)। কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূলতা, দুর্ভিক্ষ ও বহু বিভক্ত মতের মধ্য দিয়ে দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়নি। ফলে সমাজতন্ত্রের স্থলে পুঁজিতন্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।

> একশ্রেণীর মানুষের অতি দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ এত অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল যে কোন কিছুই তার গতিরোধ করতে পারেনি।... রাষ্ট্র এবং সমাজকে একেবারে দরিদ্র-দিগম্বর রেখে একা

> একটি শ্রেণি অনর্জিত অর্থে ধনী হতে চেষ্টা করলে সমাজ জীবনে যে বিষক্রিয়া হয়, বাংলাদেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে। (ছফা, ২০২০ : ৪৩)

ফলে 'সমাজতন্ত্র' কথাটির সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সুবিচার শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ ঘটে না এদেশে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর *সর্বনাশের আশায়* উপন্যাসটি বাংলাদেশের সমাজকাঠামো রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় একটি ভিন্নমাত্রিক উপন্যাস। এ উপন্যাস যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রসঙ্গকে নির্দেশ করে। এ উপন্যাসে ইমরানের আত্মকথন ও ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে লেখক বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের নানা প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ধনলিপ্সুদের স্ফীত হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। মূলত ঔপন্যাসিক সময়ের পুঁজি নির্ভর সমাজ, মানুষ ও রাজনীতিকে তার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। পুঁজিবাদী সমাজের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি অকথিত ক্রোধ ও হতাশার বোধ তিনি তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকেই উপন্যাসসমূহে প্রকাশ করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। উপন্যাসে একাত্তরের ঘাতক নজিউল্লার ছেলে কলিমুল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের ক্ষমতা যখন স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে চলে যায় তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে সে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলিমুল্লাহ খাঁটি বনস্পতি ঘি বলে শুকরের চর্বি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে। টেন্ডারবাজি করে বিত্ত বাড়ায়। ব্যবসার জন্য নৈতিকতা বিরোধী কাজ করতেও সে পিছপা হয় না। সামাজিক কোনো কাজের মধ্যেও কলিমুল্লাহ ব্যবসায়ী লাভের কথা চিন্তা করে। এরূপ মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হওয়া অনেক কলিমুল্লারাই নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ।

> স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গ্রাম এবং শহরের সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে শ্রেণী বিন্যাস। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আত্মপোষণমূলক, বিচ্ছিন্ন, অযান্ত্রিক চরিত্র অনেকখানি খর্ব হয়েছে। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে পুঁজির ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। পুঁজির নিয়ন্ত্রক ভূমিকার কারণে বাজার অর্থনীতির বিস্তার ঘটেছে, পণ্যীকরণ বেড়েছে। গ্রাম এবং শহরে নতুন অধিপতি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এই অর্থনীতি পুঁজিবাদী পথে বর্তমানের চাইতে ভিন্ন কোনো লক্ষ্যে গমন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের আওতায় বাংলাদেশে যে পুঁজির বিকাশ ঘটেছে তার ভূমিকা যতটা ব্যবসা ক্ষেত্রে ততটা উৎপাদন ক্ষেত্রে নয়। (আনু, ২০২২ : ১৩৩)

সর্বাঙ্গীণ সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাজনীতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে কলিমুল্লাদের মতো বেনিয়াদের সঙ্গে জাতির বিবেক মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেই অবৈধ পন্থায় ধনী হওয়ার পথ সুগম করতে চেয়েছে। অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে তারা উন্নীত হতে চেয়েছে ধনিক শ্রেণির কাতারে। *সর্বনাশের আশায়* উপন্যাসে তেমনই এক চরিত্র ইদ্রিস। আহত মুক্তিযোদ্ধার ভাই হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসে তার অর্থ উপার্জনের পথ :

> ইদ্রিসের হাত দিয়ে পিস্তল, রিভলবার পাচার হতে লাগলো, সরকারের বড় বড় কনস্ট্রাকশনের কাজে সে টেন্ডার দিতে শুরু করলো। তার টেন্ডার ফেরত দেয় সাধ্য কার? কখনো ফার্স্ট লেডির টেলিফোন, কখনো পকেটের পিস্তলটা একটু নাড়াচাড়া করলেই কাজ হয়। (গাফ্‌ফার, ২০০১চ : ২৪৪)

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এ উপন্যাসে আরো দেখিয়েছেন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে পুঁজির নেতিবাচক প্রভাব কীভাবে ধ্বংস করেছে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশের যে ক্লাবগুলোতে একসময় গুণী বিভিন্ন শিল্পী, অধ্যাপক, সাহিত্যিকের আড্ডা হতো;

পুঁজির দাপটে সেগুলো হয়ে উঠেছে ধনীদের মদ্যপানের কেন্দ্রস্থল। *সর্বনাশের আশায়* উপন্যাসে বিদেশ ফেরত ইমরান তার এলাকার সংস্কৃতিচর্চার ক্লাবঘর সম্পর্কে মন্তব্য করে : 'এখন এটা নব্যধনীদের আড্ডা। যার যতো পয়সার জোর, তার ততো জোর এখানে। সুতরাং মাতাল হলে কেউ দূষবে না।' (গাফ্ফার, ২০০১চ : ২৩৭)। তবে এও সত্য বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সামাজিক দ্বন্দ্ব বর্তমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ বিলম্বিত করলেও চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে নতুন কোনো পরিবর্তন এদেশের সম্ভাবনা ও শক্তিকে নতুন পথে পরিচালিত করবে না এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর উপন্যাসসমূহে গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যেখানে ব্রিটিশ শাসনের সামন্তবাদ এবং তৎপরবর্তী সময়ে বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জটিল রূপগুলোর সুচারু উপস্থাপন পাওয়া যায়। *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* ও *নীল যমুনা* বিশেষ অঞ্চল-প্রধান উপন্যাস হলেও জমিদারদের খাজনা, দখলদারিত্ব এবং সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের নিচে নিষ্পেষিত মানুষের যন্ত্রণা ও পরাধীনতার রূপ সমগ্র বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে *শেষ রজনীর চাঁদ*, *তিমির সঙ্গিনী*, *সর্বনাশের আশায়*, *নাম না জানা ভোর* প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি থেকে শহুরে শিল্প ও বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির রূপান্তরে ফুঠে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের নতুন অবয়ব। উন্মোচিত হয় সামন্ততন্ত্র অবসান-পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিকাশে উদ্ভূত নতুন রকমের শোষণ ও বিভাজনের চিত্র। সামন্ততন্ত্রের বিলোপে বাংলার মানুষের মুক্তির সংকেত উপন্যাসসমূহে থাকলেও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী পুঁজিবাদকে একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে দেখাননি; বরং একটি নতুন ধরনের সংকট ও শোষণের রূপ স্পষ্ট করে সমাজ সংগঠনের রূপান্তর প্রক্রিয়ার পথযাত্রা নির্দেশ করেছেন।

আকরগ্রন্থ

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (২০০১)। *উপন্যাস সমগ্র*। জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা

ক. *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান*

খ. *নীল যমুনা*

গ. *নাম না জানা ভোর*

ঘ. *তিমির সঙ্গিনী*

ঙ. *শেষ রজনীর চাঁদ*

চ. *সর্বনাশের আশায়*

সহায়ক গ্রন্থ

অমলেন্দু দে (২০১৭)। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী*। বিগ বুকস, কলকাতা।

আনু মুহাম্মদ (২০২২)। *বাংলাদেশের কোটিপতি মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক*। বাঙ্গালা গবেষণা, ঢাকা।

আহমদ ছফা (২০২০)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এম এম আকাশ (১৯৯৩)। 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড, (সম্পাদক: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা (২০১৯)। *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৩)। 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত', *বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি*। পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

বিনায়ক সেন (২০১৪)। 'রাজনৈতিক যে বাস্তবতা বুঝতে হবে', সাক্ষাৎকারগ্রহীতা : ফারুক ওয়াসিফ, সাক্ষাৎকারদাতা : বিনায়ক সেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মার্চ ০১, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ। *দৈনিক প্রথম আলো*, (সম্পাদক : মতিউর রহমান), ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা (২০১৮)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

মিলান কুণ্ডেরা (২০১২)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, (অনুবাদঃ সঞ্জীবন সরকার)। সন্দেশ, ঢাকা।

মীর মশাররফ হোসেন (১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। *জমিদার দর্পণ*, শ্রীরামসর্ববস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, কলকাতা।

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোঃ মঞ্জুর কাদের ও অন্যান্য (২০২০)। *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান*, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রংগলাল সেন (২০১৪)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা।

রঙ্গনকান্তি জানা (২০১৭)। 'বাঙালি মধ্যবিত্তের যৌনতার তালাশ', *মধ্যবিত্ত বাঙালি : অন্তরমহল*, (সম্পাদনা : খোকন কুমার বাগ, রঙ্গনকান্তি জানা)। রক্তকরবী, কলকাতা।

শহীদ ইকবাল (২০০৩)। *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*। সাহিত্যিকা, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৩)। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি অর্থনীতি', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড, (সম্পাদক :অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৭)। *পুঁজিবাদের দুঃশাসন*। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

স্বপন বসু (১৯৮৫)। *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

হাসান আজিজুল হক (২০১১)। 'মধ্যবিত্তের বিত্তহীন সাহিত্য', *প্রবন্ধসমগ্র ২*। অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

Bottomore, T.B. (1993)। *A Dictionary of Marxist Thought*, Oxford। Blackwell Publishing, UK.

Emile Durkheim (1997)। *The Division of Labor in Society,* Translated by W.D. Halls। Free Press, USA.

Hunter W.W. (1876)। *The Indian Mussalmans*, 3rd Edition। Oxford University Press, London.

Marx Karl & Engles Friedrich (2018)। *The Communist Manifesto*। Vintage, London, Selected works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow.